OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 651 - 661
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তাম্রলিপ্তের ঐশ্বর্য : প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ

শর্মী চক্রবর্তী
স্যাক্ট অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী মহাবিদ্যালয়, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: Sharmisayak@gmail.com
0009-0001-7159-1448

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Ancient Period, Archaeological Sources, Trading Port, Religion, Freedom Movement, Eminent Personalities.

Abstract
Tamralipta, known today as Tamluk, is one of the ancient and historically significant cities of Bengal. It is situated on the left bank of the Rupnarayan River in the north-eastern part of Purba Medinipur, West Bengal. From ancient times to the present day, Tamralipta has played an important role in the history, culture, religion and political life of Bengal.References to Tamralipta as a port and kingdom can be found in the Mahabharata, the Puranas and other ancient texts. The Buddhist Mahavamsa and the accounts of the Greek traveller Megasthenes also mention the importance of the region. The Chinese traveller Xuanzang (Hiuen Tsang), who visited India in the seventh century CE, described Tamralipta as a prosperous port situated near the Bay of Bengal. These accounts indicate its importance as an ancient centre of maritime trade.Tamralipta is also rich in religious and archaeological heritage. The famous Bargabhima Temple is an important historical and religious landmark. The remains of ancient Buddhist monasteries and other archaeological objects preserved in the Tamluk Museum provide valuable evidence of its glorious past. The history of the Tamralipta Rajbari is also an important part of the region's heritage.During British rule, Tamralipta became an important centre of the freedom movement. Hamilton School and its teachers and students helped to spread patriotic ideas. Khudiram Bose, Sushil Kumar dhara and Ajay Mukhopadhyay are among the personalities associated with this patriotic tradition. The people of Tamluk actively participated in the Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement, Salt Satyagraha and Quit India Movement.The formation of the Tamralipta National Government in 1942 was a remarkable event in the history of the freedom struggle. Despite British repression, the people remained determined. Matangini Hazra, a seventy-three-year-old freedom fighter, sacrificed her life during the movement. Mahatma Gandhi and Subhas Chandra Bose also visited Tamluk. Tamluk Leaders such as Ajay Mukherjee, Sushil Dhara and Satish Samanta were associated with its political history.Tamralipta has also enriched Bengal's intellectual and artistic heritage. Acharya Prafulla Chandra Ray, Kazi Nazrul Islam, Mukunda Das, Suniti Kumar Chatterji and Dr. Srikumar Banerjee visited the region. Artist Paresh Maity, who received the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Padma Bhushan in 2014, has brought international recognition to the region.Thus, from ancient times to the present, Tamralipta has preserved its historical glory. Its maritime heritage, cultural traditions, freedom struggle and artistic achievements make it an important and valuable part of Bengal's history.

Discussion

পৌরাণিক যুগ থেকে তাম্রলিপ্ত জ্ঞান-গরিমা শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। তাম্রলিপ্ত শহরটি ভারতের পূর্বাংশে অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নবীনতম জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর পূর্বাংশে প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তের নামকরণ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বহু মত আছে। মহাভারতীয় কাল থেকে হদিস মেলে এই তাম্রলিপ্তের। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।[১] পুরানে তো বারবারই এই জনপদটির দেখা মেলে। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থেও তাম্রলিত্তি (তাম্রলিপ্ত) বঙ্গজনদের অধিকার ছিল বলে উল্লেখিত আছে। দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) আবার সুহ্মের অন্তর্গত বলে বর্ণিত আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে, ইৎ সিং এর বিবরণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বর্ণনা সুবিদিত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল তাম্রলিপ্ত, তা সুস্পষ্ট হওয়া যায় জাতকের দামলিপ্তি এবং হিউ-য়েন-সাং এর তা-মো-লিহ্-তি থেকে।[২] সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য পথের আভাস ফা-হিয়েন রেখে গেছেন (চতুর্থ শতকে)। তার তিন থেকে চার বছর আগে টলেমির গ্রন্থে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়।

ভীষ্ম পর্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সেকালের পুণ্যবান নদী ও জনপদের বর্ণনার সময় তাম্রলিপ্ত নাম উল্লেখ করেছেন।

"সঞ্জয় : কক্ষা গোপাল কক্ষাস্চ জঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ/ কিরতবর্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপটিকাঃ।"[৩]

তাম্রলিপ্ত নামটি তামা থেকে এসেছে বলে কোন কোন পন্ডিতের অভিমত।[৪] তাম্র বা তামার ব্যবহার হতো গোটা রাজ্যজুড়ে। তামা সহজলভ্য হওয়ায় এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু মানুষ। তামা কেন্দ্রিক সভ্যতাই তাম্রলিপ্ত। এই তাম্রলিপ্তিয়ান সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, পাওয়া যায় যার বহু প্রমাণ।

আবার তাম্বুল শব্দ থেকেও হতে পারে তাম্রলিপ্ত। এই অঞ্চলে উৎপন্ন হত প্রচুর তাম্বুল বা পান। বর্তমান সময়ও পানের চাষ হয় ব্যাপকভাবে। দেশ শুধু নয় বিদেশেও চাহিদা রয়েছে এখানের উৎপাদিত পানের। সুতরাং এমন জায়গাকে তাম্রলিপ্ত না বলার নেই কোন কারণ।

রাজা তাম্রধ্বজ নাম থেকে তাম্রলিপ্ত নগর হয়েছে এমন অনেকে মনে করেন।[৫] তাম্রধ্বজ ছিলেন বীর। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া করেছিলেন আটক। এমন এক বীরের নামে রাজধানীর নাম হতেই পারে তাম্রলিপ্ত। ভবিষ্য পুরাণে লেখা আছে, -

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশ চ বর্গভীমা বিরাজতে/ গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধ্বনি তটে।"[৬]

বর্গভীমা দেবী তাম্রলিপ্ত বিরাজ করেন। বর্গভীমা দেবী রূপনারায়ণ নদীর ধারে তমলুক ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলে আজও জানা যায়নি। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমানের তমলুক-ই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত। বায়ু পুরানে লেখা আছে, -

"ব্রহ্মওরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ।
এতান জনপদার্নযান গঙ্গা ভাবয়তে শুভান।"[৭]

তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহলের রাজা মৌর্য সম্রাট অশোকের দরবারে প্রেরণ করেন চারজন দূত। দুতগণ তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই গমন করেন অশোকের রাজসভায় এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এই পথ দিয়েই। আবার সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপস্থিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান।[৮]

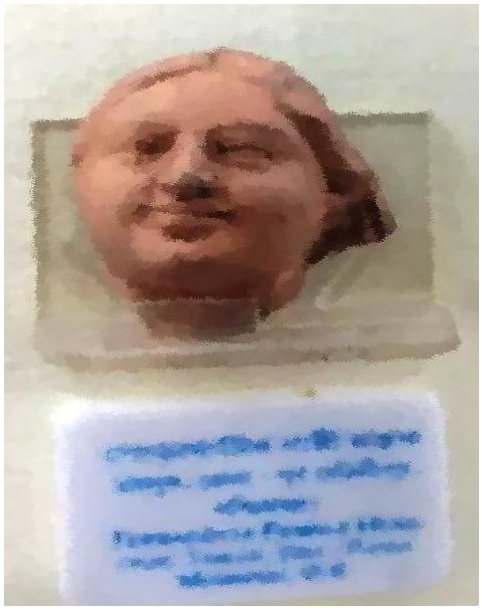
OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মোগল সম্রাট আকবরের সময় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীতে' লেখা হয়েছে তমলুক।[৯] এর থেকে সুস্পষ্ট তাম্রলিপ্তের ছাপ প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত হয়ে আছে।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্র লাল মিত্র, জেনারেল কানিংহাম সাহেব, এম এল ফিনস্টোন, ড: ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হান্টার সাহেব, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত। প্রভৃতি অনেকেই বলেছেন বর্তমানের তমলুক-ই প্রাচীন সমৃদ্ধশালী সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত।[১০]

তাম্রলিপ্তের প্রাগৈতিহাসিক বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করেন গুরুদাস বসাক। যিনি বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর এই কাজের ফলাফল ১৮৮৯ সালে প্রকাশ করেন দা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল পত্রিকায়। এরপরে ১৯৪০ সালে একই ধরনের কাজ করেন টি. এন. রামচন্দ্রন এবং কে.এন. দীক্ষিত। এনারা খুঁজে পান পোড়ামাটির নানা রকম জিনিস, মাটির পাত্র ও মুদ্রা। এগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ বছর প্রাচীন বলে ধারণা করেন।

স্বাধীনতার পরে পি.সি. দাশগুপ্ত ক্যালকাটা রিভিউতে ১৯৫৩ সালে উল্লেখ করেছেন তাম্রলিপ্তের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা। তাম্রলিপ্ত শহরকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রত্নসংস্কৃতির নিদর্শন প্রাপ্তির স্থান। তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলির মধ্যে অন্যতম হল পোড়ামাটির নানা রকমের জিনিসপত্র। যার মধ্যে রয়েছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের পোড়ামাটির দেবদেবী নারী ও পাথরের খোদাই করা মূর্তি। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে অলংকৃত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, পুরুষ ও নারী মূর্তি, টেরাকোটার যক্ষী মূর্তি ইত্যাদি। কিছু পুরাতন জিনিসপত্র রয়েছে তাম্রলিপ্ত শহরে অবস্থিত হ্যামিলটন সাহেবের নামাঙ্কিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংগ্রহালয়ে এবং ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সতীস্মৃতি সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত প্রত্নসংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন হল অমরাবতী ভাস্কর্য শৈলী নির্মিত বালি পাথরের একটি বুদ্ধ মস্তক। এই নিদর্শনটি গুপ্ত যুগের আনুমানিক চতুর্থ শতকের। তাছাড়াও পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের প্রাচীন কিছু মুদ্রাও পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে পদ্ম, চক্র, হস্তি, মৃগ ও সিংহ চিহ্নিত। এছাড়াও এখান থেকে ১৮৬৮ সালে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের একটি রৌপমুদ্রা ও ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত প্রথম কনিষ্কের একটি তাম্র মুদ্রা এবং মোগল ও পাঠান যুগেরও কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এসব মূল্যবান নিদর্শন তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় ও গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষিত রয়েছে। এখনো তাম্রলিপ্ত নানা জায়গা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়।



পোড়া মাটির নারী মস্তক



প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

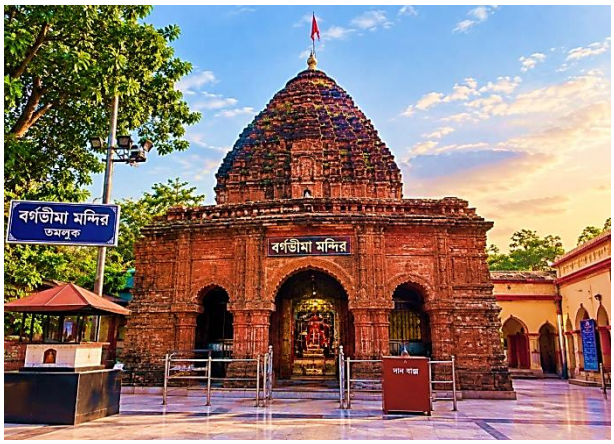
দূর দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বণিকরা তাম্রলিপ্ত বন্দর শহরে আসতেন বাণিজ্য করতে। সবচেয়ে দূর থেকে নিয়ে আসা যে বাণিজ্যিক সামগ্রী তাম্রলিপ্তে আমদানি ও রপ্তানি করা হত তা হল মধ্য এশিয়ার ঘোড়া। যেসব বন্দর দিয়ে সমুদ্রপথে ঘোড়া বিদেশে রপ্তানি হত তাদের মধ্যে একটি তাম্রলিপ্ত। বিশেষ একধরনের বৃহৎ আকারের জাহাজে তাম্রলিপ্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (মালয় উপদ্বীপে বা জাভা সুমাত্রায়) যেসব ঘোড়া নিয়ে আসা হত সেগুলি আঞ্চলিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আবার অনেকগুলিকে চীন দেশেও চালান দেয়া হত।[১১] মধ্য এশিয়ায় ঘোড়ার আমদানি ও রপ্তানি ছাড়াও অন্যান্য নানা দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি তাম্রলিপ্ত বন্দরের মারফত হত। রপ্তানির তালিকায় ছিল ঘষা কাঁচ, খুব উন্নত মানের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, চাল, মুক্তা, সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইত্যাদি। সোনা, রুপো, পট্ট বস্ত্র, কড়ি ইত্যাদি আমদানি করা হত। তাছাড়া আমদানি করে রপ্তানি করা হত হিমালয় অঞ্চলে উৎপন্ন তেজপাতা, কয় প্রকার গুল্ম থেকে তৈরি সুগন্ধি তেল এবং মুক্তা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত তমলুক থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির নিদর্শন এর উপর বিদেশি শিল্প রীতির প্রভাব লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরে গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহ নিয়মিত বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রপথে আসতেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর শহরের এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও খ্যাতি যে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তা হাজারীবাগ জেলায় প্রাপ্ত দুধ পানি প্রস্তর লিপি থেকে জানা যায়।[১২]

ষোড়শ শতকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে যে ওই কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগর একসময় রূপনারায়ণের উপর দিয়ে বাণিজ্যতরী নিয়ে সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য করতে যান।[১৩] সেই সময় তিনি তমলুকে নোঙর করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেন, একজন লোক একটি সোনার কলসি নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি জানতে চান কোথা থেকে সেটি সংগ্রহ করেছেন। লোকটি তখন একটি বিস্ময়কর কাহিনী তুলে ধরেন। বললেন জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক কূয়ো রয়েছে যেখানকার জলে পিতলের পাত্র ডোবালেই তা সোনার পাত্র হয়ে যায়। কুয়োর সন্ধান নিলেন তারপর তিনি তমলুকের বাজারে যত পেতলের পাত্র ছিল তা কিনে নিলেন। কূয়োর জলে সেগুলি ডোবাতে হাতে হাতে ফল পেলেন। সব পাত্রই সোনা হয়ে গেল। সেখানে সেসব পাত্র বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করলেন যা তিনি কখনো কল্পনা করতে পারেননি। ফেরার সময় তিনি তমলুকে বাণিজ্য তৈরি থামালেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ওই কুয়োর উপরই তিনি বর্গভীমা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মন্দির স্থাপন করলেন। অনেকের বিশ্বাস সেই মন্দিরটি হল বর্তমানের বর্গভীমা মন্দির।[১৪]

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। কথিত আছে সম্রাটের পুত্র ও কন্যা মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে বোধিবৃক্ষের চারাসহ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সম্রাট অশোক নিজেই রওনা করে দিয়েছিলেন।[১৫] তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রধান রাজ্যে সেই সময় পরিণত হয়েছিল।[১৬] বৌদ্ধমঠ বৌদ্ধস্তূপ ও সংঘারামের ভগ্নাবশেষ সহ বহু প্রত্নবস্তুর সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। আনুমানিক ৪০০ থেকে ৪১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন সময় দু'বছর এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাম্রলিপ্ত নগরীতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ২২টি বৌদ্ধ বিহার এবং প্রত্যেকটিতেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীতে ভর্তি। বিহার গুলির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর পরের প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্ত নগরীতে এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং রেখে গেছেন এই নগরীর বিবরণ। তিনি তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন তখন তমলুকে ছিল মাত্র 10টি বৌদ্ধবিহার। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং তাম্রলিপ্ত এসেছিলেন ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি এখানকার বৌদ্ধ বিহারে ধর্ম গুরুদের বৌদ্ধ আচার সমূহের চর্চার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন এবং এখানে কিছুদিন থেকে সংস্কৃত ভাষা শিখে একটি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইৎ সিং এর সময় বিহারের সংখ্যা তমলুকে মাত্র ৫-৬টিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।[১৭] এই সময় থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হয়।

তাম্রলিপ্ত বর্গভীমা মন্দিরটি ৫১টি শাক্তি পীঠের মধ্যে একটি বলে অনেকে মনে করেন। তমলুক নগরের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের আরাধ্য এই নগরদেবীকে নিজেদের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এবং নানা মনস্কামনায় পূজা দেন। আজও দেবী বর্গভীমা তমলুকের মানুষের অন্তরের আরাধ্যদেবী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



বর্গভীমা মন্দির

শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় বাণীতে সারাদেশ যখন উত্তাল তখন তমলুক ও তার ব্যতিক্রম ছিল না।[১৮] এমনই এক বৈষ্ণব ধর্মের মন্দির তমলুকের হরির বাজারে যা চার চালা জগমোহন যুক্ত দক্ষিণমুখী। হরির মন্দিরের নামে এলাকার নাম হরি বাজার। মন্দিরের সূচনা ও কিংবদন্তী দিয়ে ঘেরা। তমলুকের প্রথম ইতিহাসকার উমাচরণ অধিকারীর ১২৮০ বঙ্গাব্দে লেখা, 'তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ' থেকে এই মন্দির সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিংবদন্তিতে আছে তাম্রলিপ্ত রাজ তাম্রধ্বজ তাম্রলিপ্তে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকে দিয়েছিলেন। পরিনতিতে যুদ্ধ হয় অর্জুনের সঙ্গে। মহাত্মা অর্জুন বহুক্ষণ সংগ্রামের পরেও জয়ের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না দেখে শ্রীকৃষ্ণকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তুমি যার সঙ্গে যুদ্ধ করছ তিনি পরম বৈষ্ণব। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের আশা অর্জুনের দূরাশামাত্র। রাজার বীরত্বে মুগ্ধ অর্জুন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং তারই ফলস্বরূপ কৃষ্ণার্জুন মন্দির স্থাপিত হয়। তবে বন্যার প্রকোপে নদীগর্ভে মন্দিরটি বিলীন হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য আজ থেকে ৫০০ বছর আগে হরিরবাজারে একটি দেবতা বিষ্ণুর মন্দির তৈরি করা হয়েছে যা বাংলার শিল্পশৈলীর ইতিহাসে এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণার্জুন মন্দিরের ঢিল ছোড়া দূরত্বে আরও এক বৈষ্ণব ধর্মের মন্দির আছে। বৌদ্ধধর্ম আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতই তমলুক প্লাবিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যর প্রেমময় বাণীর দ্বারা (ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই)। তমলুকের রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি রঘুনাথ জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬০ থেকে ১৮৮৮ এর মধ্যে।

তাম্রলিপ্ত তথা তমলুকের রাজ পরিবারের ইতিহাস বহু প্রাচীন এবং নানা কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গৌড়ধ্বজ এই চারজন রাজা, তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করেন।[১৯] এরপর পঞ্চম রাজা হন বিদ্যাধর রায়। এরপর ৪৬ তম রাজা হন শ্রীমন্ত রায় এবং ৫৬ তম রাজা হন আনন্দ নারায়ণ রায়। তারই উত্তরাধিকারী রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, আজও তমলুকে বসবাস করেন।

বর্তমানে তমলুকে যে বিশাল ভগ্নদশা প্রাপ্ত রাজবাড়ী দৃষ্ট হয়, তা নির্মাণ করেন রাজা লক্ষীনারায়ণ রায় (১৮২১ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে)। এই জন্য রাজবাড়িটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় রাজবাড়িটির দ্বিতলে ছিল অস্ত্রাগার বিশাল সভাগৃহ এবং নিচের তলায় সুরঙ্গ পথে ও সৈন্যদের গোপন আবাসস্থল। শুধু তাই নয়, দেওয়ালের ভেতর দিয়ে গোপন পথে যাতায়াত করার ব্যবস্থা ছিল। বাড়িটি চুন, সুরকি ও পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি খিলান দেওয়া দালানযুক্ত। রাজবাড়ির সংলগ্ন প্রাচীন রাধা বিনোদ ও রাধারমনজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই রাজ পরিবারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৩৮ সালের ১১ই এপ্রিল তমলুকের তৎকালীন বর্ষিয়ান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জননেতা অনন্য দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর জনসভার আয়োজন করেন এই রাজ বাড়ির সংলগ্ন অঞ্চলে। এই বাড়িতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। এই বাড়িতেই প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক তপন সিংহ 'কেদার রাজা' সিনেমার চিত্রগ্রহণ করেন।[২০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



তমলুক রাজবাড়ী

তমলুক রাজবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় খাটপুকুর একটি বৃহৎ সরোবর। কথিত আছে রাজা তাম্রধ্বজ ও তার রানী তমলুকে এই প্রকাণ্ড দিঘীটি খনন করে তার মধ্যে একটি মন্দির স্থাপন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরিজনবর্গের সঙ্গে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করার সময় অকস্মাৎ পুকুর জলরাশিতে পূর্ণ হয় এবং তাম্রধ্বজ রাজা এবং তার রানী উভয়ে সেই জলে ডুবে মারা যান। বর্তমানে এই দীঘির নাম খাটপুকুর। পুকুরের জলের মধ্যে সেই মন্দির এখনো নিমজ্জিত অবস্থায় আছে।



তমলুক খাটপুকুর

তমলুক শহরে ধোপা পাড়ায় রক্ষিত একটি বড় প্রস্তরখণ্ড নেতা ধোপানির পাট নামে পরিচিত। পাট মানে ধোপার কাপড় কাচার তক্তা বা পাটা। কথিত আছে রূপনারায়ণ নদীর তীরে একটি ঘাটে নেতা ধোপানি প্রতিদিন কাপড় কাচত। চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা তার মৃত পতি লক্ষিন্দরকে ভেলায় চাপিয়ে স্বর্গে দেবতাদের কাছে যাবার সময়ে এখানেই নেতা ধোপানির দেখা পেয়েছিল। বেহুলা দেখে নেতা ধোপানির কাপড় কাচা সময় তার এক দুরন্ত ছেলে তাকে বারবার বিরক্ত করছে। এতে নেতা রেগে গিয়ে ছেলেটিকে এক থাপ্পড় মেরে নিচে ফেলে রাখল। কাপড় কাচা শেষ হলে সে মৃত ছেলের উপর জল ছিটিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল। তাই দেখে বেহুলা গিয়ে তার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার অনুরোধ করলো। কিন্তু নেতা কেবল নিজে যাকে অচেতন করে তাকে পুনর্চেতন করতে জানতো। তবে সে বেহুলার কাছে তার দুঃখের কাহিনী শুনে সে যাতে ন্যায়বিচার পায়, তার ব্যবস্থা করে। দেবতাদের একটি সভায় বেহুলা যায় এবং নৃত্য পরিবেশন করে। বেহুলার অপূর্ব নৃত্য শৈলী ও সরলতা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে এবং দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে মনসাকে লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বলেন। মনসা শর্তসাপেক্ষে বেহুলার স্বামী লক্ষীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। সংক্রান্তির সময় রূপনারায়ণের তীরে এইখানে বিরাট মেলা বসে।[২১]

তাম্রলিপ্ত বা তমলুক শহরে প্রাচীন যুগের যেমন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তেমন আধুনিক যুগে ব্রিটিশ আমলেও কিছু বিদ্যালয়, বাড়ি এবং কিছু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যা আমাদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিছু ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে হ্যামিল্টন হাই স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য।[২২] ১৮৫২ সালের মে মাসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের একটি ঘরে হ্যামিল্টন সাহেব থাকতেন,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে ছিল তার নুনের গুদাম। আজও সেই পুরাতন স্থানটি রয়েছে যেখানে এখন শিক্ষক মহাশয়গণ বসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই স্কুলের ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্দ্বিধায় যেমন ক্ষুদিরাম বসু, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন রক্ষিত, সুশীল কুমার ধারা, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমূখ। বর্তমান বিদ্যালয়টি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত।

তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুলে ক্ষুদিরাম অধ্যায়ন করেন প্রায় চার বৎসর ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। তমলুকে ক্ষুদিরামের সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ ঘোষ, আশুতোষ মিশ্র। এদের মধ্যে সর্বাধিক বন্ধুত্ব ছিল রাধা বল্লভ বাবুর সঙ্গে। হ্যামিল্টন হাই স্কুলের এক শিক্ষক একদিন ক্লাসে ছাত্রদের মুষ্টির জোর পরীক্ষার জন্য টেবিলে ঘুষি মারতে আহ্বান জানান। উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কেউ সাত/ আটটির বেশি ঘুষি মারতে পারল না। কিন্তু ক্ষুদিরাম একে একে ৩০টি ঘুষি মারল। তখন সকলে প্রত্যক্ষ করল খুদিরামের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। শিক্ষক মহাশয় ক্ষুদিরামের রক্তাক্ত হাত ধরে বললেন –

“ধন্য ক্ষুদিরাম তুমিই প্রথম।”[২৩]

শুধু সহকর্মীদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম নয়, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ইতিহাসে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চেও প্রথম শহীদ। সুস্থ সবল পেশীবহুল দেহের অধিকারী হয়েছিল ক্ষুদিরাম নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার ফলে। ক্ষুদিরাম তমলুকে ছাত্রাবস্থায় ‘মাতৃসদন’ নামে অভিহিত ব্যায়াম সমিতিতে ব্যায়াম চর্চা করতেন নিয়মিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওই ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন হ্যামিল্টনের ছাত্র যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়। যিনি পরবর্তী কালে বিখ্যাত বিপ্লবী রূপে পরিগণিত হন। যদু গোপালের পিতা কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তমলুক কোর্টের আইনজীবী। এই আখড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, গিরিজা অধিকারী, ব্রজেন্দ্রকুমার দাস প্রমুখ। আখড়ার অবস্থান ছিল বর্গভীমা মন্দিরের পার্শ্ববর্তী রক্ষিতদের বাড়ির বাগানে। অল্প দিনের মধ্যে এই আখড়ার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন ক্ষুদিরাম। একবার তমলুকে কলেরার প্রভাবে বহু লোক মারা যায়। সেবা সুশ্রষা মৃতদেহ সৎকারে ক্ষুদিরাম ঝাঁপিয়ে পড়েন। তমলুকে ছাত্রাবাস্থায় স্কুলের টিফিনের সময় ছাত্ররা গাছে উঠত। একদিন শ্রেণী শিক্ষক প্রত্যক্ষ করলেন ক্ষুদিরাম গাছের মগডালে উঠে দুহাতে করতালি দিচ্ছেন আনন্দে। ছাত্রদের নেমে আসতে আদেশ দিলেন তিনি। নেমে এলো সকলে। ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে একেবারে মগডাল থেকে মাটিতে। ছিড়ে গেল পরনের জামা ক্ষতবিক্ষত হল অঙ্গ। তথাপি নিঃশব্দে শিক্ষকের সম্মুখে দাঁড়ালেন ক্ষুদিরাম। যেন কিছু হয়নি, কোন বেদনার চিহ্ন যেন নেই। মুখে, চোখে নেই জল। শুধু ছাত্রাবস্থায় নয়,স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা অনুরূপ। ফাঁসির মঞ্চে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম নির্বিকার। ভয় লেশহীন।

ক্ষুদিরামের সহপাঠী আশুতোষ মিশ্রের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, একদিন স্কুলের টিফিনের সময় ক্ষুদিরামরা যখন খেলায় মত্ত সেই সময় এক ফেরিওয়ালা এসে দাঁড়ালো খাবারের ঝুড়ি নিয়ে। এক ক্রেতা ছাত্র একই দামে কিছু বেশি খাবার চাইতে ফেরিওয়ালা সেই ছাত্রকে কটু মন্তব্য করেছিল। কথা কানে গেল ক্ষুদিরামের। খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ফেরিওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তুলতে ব্যস্ত, এমন সময় প্রচন্ড লাঠির ঘায়ে তার ঝুড়ি পরল উল্টে, ছোলা মটর ভাজা প্রভৃতি ছড়ালো মাটিতে। ফেরিওয়ালা অভিযোগ করল প্রধান শিক্ষকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে পাঠালেন ক্ষুদিরামকে। ক্ষুদিরাম বললেন ‘খাবার পর একটু ফাও চেয়েছে বলে আমার বন্ধুকেও গালি দিয়েছে। আমি কোনদিন অন্যায় সহ্য করিনি, করবো না। এতে আমার যা শাস্তি হয় তা আমি মাথা পেতে নেব। ক্ষুদিরামের সত্য পরায়নতা ও স্পষ্টবাদিতায় সন্তুষ্ট হলেন প্রধান শিক্ষক অল্প সাজা দিয়ে এবং মৃদু সাবধান বাণী উচ্চারণ করে ছেড়ে দিলেন ক্ষুদিরামকে। সেদিন ক্ষুদিরামের বন্ধু বৎসল্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর বন্ধুরা চাঁদা তুলে তাকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। তমলুকে ক্ষুদিরামের ছাত্র জীবনের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ক্ষুদিরাম শুধু লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেননি। শিক্ষার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, মানসিক উৎকর্ষ সাধন, হৃদয় বৃত্তির সম্প্রসারণ, সামাজিক মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা, সেইসব পথের পথিক হয়েছিলেন। তাঁর সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, ত্যাগ, সেবা, শক্তি ও স্বদেশ প্রীতি প্রভৃতি মানবিক গুণ ছিল। যুগে যুগে যুব সমাজের সম্মুখে ইতিহাস সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তিনি।[২৪]

ব্রিটিশ শাসনের আদি পর্বে মেদনীপুরের দুইজন বীরাঙ্গনার নাম উল্লেখযোগ্য। যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেন শক্তি সাহস আত্মবিশ্বাসে ও সুদৃঢ় চিত্তে। একজন হলেন তমলুকের রানী কৃষ্ণ প্রিয়া আর অন্যজন হলেন চুয়াড় বিদ্রোহের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নেত্রী রানী শিরোমনি। উভয় সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে তেজস্বীতা এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি পোষণ করেছিলেন সেই গৌরব দীপ্ত ঐতিহ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের নারী সমাজকে প্রেরণা দিয়েছে মরন পথ সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরে মহিলা শহীদ ৬ জন। আর তমলুক শহরে 1942 এর আন্দোলনে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনীর অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন সবেতেই তমলুক শহরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

হরিপুরা কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন তমলুকে। ১৯৩৮ এর ১১ এবং ১২ই এপ্রিল জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাদর আমন্ত্রণে তার শুভাগমন হয়েছিল তমলুকে।[২৫] তমলুক মহকুমার তখনকার সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাইতি মহোদয়ের চেষ্টায় প্রথমে তমলুকে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এবং অভিভাষণের আয়োজন করা হয় এবং জনসভার স্থান স্থির হয় তমলুক রাজ ময়দান। কিন্তু বিরোধিতা আসে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মহাকুমা নেতৃবৃন্দ বিকল্প স্থানের সন্ধান করেন। সেখানেও প্রশাসনের বিরোধিতা আসে। অতঃপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত প্রামাণিক, কুমার চন্দ্র জানা, সতীশ চন্দ্র সামন্ত প্রমূখ রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্রদ্বয়ের মাধ্যমে রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উদারচেতা সম্পন্ন রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় খাট পুকুরের উত্তর পাড়ে আমবাগান সংলগ্ন মাঠে সুভাষচন্দ্রের জনসভার ব্যবস্থা করতে সম্মত হন। বেলা প্রায় এগারোটার সময় শঙ্খ ধ্বনি এবং পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে এবং দূর্বাচন্দন দিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে বরণ করা হয়েছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ। তিনিও ছিলেন দেশপ্রেমিক। তমলুক পৌরসভা সর্বপ্রথম, তারপর রাজ পরিবার কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বোসকে সম্বর্ধনা প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারপর নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের অভিভাষন : তিনি তার অভিভাষনের প্রথমে তমলুক তথা মেদিনীপুরবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, নানা দুঃখ কষ্ট সহন, কারাবরণ, চরম আত্মত্যাগ, শহীদদের আত্মৎস্বর্গ প্রভৃতির স্মরণ ও সম্মান জ্ঞাপন করেন। তারপর ভবিষ্যতে স্বরাজের লক্ষ্যে অধিকতর সংগ্রামে প্রস্তুতি কিরকম ভাবে নেয়া হবে এবং হিন্দু, মুসলিম, হরিজন, নারী এবং পুরুষ সর্বশ্রেণীর জনগণের কংগ্রেসের পতাকা তলে সামিল হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনের আহ্বান জানান। দুপুরে বিশ্রামের পর বিকালে বর্গভীমা মন্দিরে এবং তারপর তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিনি গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় রাজবাড়ীর আটচালায় কংগ্রেস কর্মীদের সভায় ভাষণ দেন। সকালে রাজবাড়ীতে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিকূল পরিবেশে সভার সুব্যবস্থা করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি কাঁথি মহকুমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তমলুকের নিমতৌড়িতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে। সেখানে গেলে তিনটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। নাম ফলকে লেখা আছে তিনটি নাম সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধারা।[২৬] তমলুকের প্রায় সব বাসিন্দায় তাদের চেনেন। স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

১৯৪২ সাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভারতের বাইরে। সেখান থেকে চালাচ্ছেন তার সংগ্রাম। দেশে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। তাকে ঘিরেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন ভারতবাসী। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট ভারতছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন মহাত্মা গান্ধী।[২৭] কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের বড় বড় শহরগুলি, সঙ্গে ছোট ছোট শহর গ্রাম ও জনপদেও আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। বেশ কিছু এলাকায় হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। থানা, আদালত, ডাক অফিস সবকিছুর ওপরই হামলা শুরু হয়। ঠিক এই সময়েই আশেপাশের বেশ কিছু এলাকায় তৈরি হয়েছিল জাতীয় সরকার। সেগুলির মধ্যে একটি হল বাংলার বুকে তৈরি হওয়া তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। যাদের হাতে এই সরকার তৈরি হয়েছিল তারা হলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধারা।

১৯৪২ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর এক ব্যাপক ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা কার্যকর করেন তমলুকের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সর্বপ্রথম তারকাটা হল ২৭ মাইল ব্যাপী টেলিফোন টেলিগ্রাফের।[২৮] ১৯৪টি পোস্ট উপরে ফেলা হল। ২০টি খাদ তৈরি করা হল যাতে সহজে মেরামত করা না যায়। ভেঙে ফেলা হল ৩০টি ক্যলভার্ট। রাস্তার ওপর বড় বড় গাছ কেটে শুইয়ে রাখা হল, গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতের অসুবিধার লক্ষ্যে। ১৯৪২ এর ২৯ শে সেপ্টেম্বর ৫টি প্রবেশ পথ দিয়ে জনতার মিছিল এগিয়ে চলল থানার দিকে। ব্রিটিশ পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। মিছিলের প্রায় অনেকেই গুলিবর্ষণের ফলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আহত হলেন। তাদের মধ্যে একজন বিপ্লবী রামচন্দ্র বেরার পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে থানার কাছে ফেলে রাখল। একটু জ্ঞান ফিরতে থানার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন রামচন্দ্র অসুস্থ আহত শরীরে সব যন্ত্রণা ভুলে যথাসাধ্য চিৎকার করে বললেন, 'আমি এসেছি থানা দখল করেছি তোমরা অজয়দাকে বল আমি থানা দখল করেছি।' কথাগুলি উচ্চারণ করে চিরতরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রামচন্দ্র বেরা স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ।

উত্তর দিক দিয়ে আরেকটি মিছিল এগিয়ে চলল দৃঢ় পদক্ষেপে অভীষ্ট সংকল্প সাধনে। নেতৃত্বে ৭৩ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতি মাতঙ্গিনী হাজরা,[২৯] যিনি গান্ধী বুড়ি নামে সমাধিক পরিচিতা। শুরু হয় গুলিবর্ষণ তবুও মাতঙ্গিনী সম্মুখে অকুতোভয়। পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হল বাম হাতের কোনুই। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শঙ্খ। দ্বিতীয় গুলিতে তার ডান হাতের কোনই বিদ্ধ হল। তবুও জাতীয় পতাকা দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ। তৃতীয়গুলি তার ললাট বিদ্ধ করে। মাতঙ্গিনী দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জাতীয় পতাকা তখন ও হাতের মুষ্টিতে আবদ্ধ। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী জীবন উৎসর্গ করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে।

এ যেন এক লোমহর্ষক কাহিনী, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। সেই দিন তমলুকের বুকে দশ শহীদ বুকের রক্ত দিয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ তৈরি হল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এই দশ শহীদের মধ্যে দুইজন কিশোর, ৭ জন যুবক, একজন ৭৩ বছর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা। তাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ মাঝী নামে এক ব্যক্তির বাম হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছিল।[৩০]

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্রের নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পরিধি ছিল যথাক্রমে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম।[৩১] ১৯৪৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি ঘোষণা পত্র বেরোয়, বিপ্লবী পত্রিকায়। সেখানে বলা হয়েছিল তমলুক মহকুমা কংগ্রেস তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারত যখন স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সেখানে এই জাতীয় সরকার যোগ দেবে। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার তৈরি হওয়ার বহু আগে থেকেই ওই এলাকা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিদ্যুৎ বাহিনী। ব্রিটিশ পুলিশ সেনার সঙ্গে টক্কর নিয়েছেন এই বাহিনীর সদস্যরা। জেলায় বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে বিদ্যুৎ বাহিনী, যার নেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধারা। এটিকেই জাতীয় বাহিনী ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি ছিল মহিলাদের তৈরি ভগিনী সেনাও। সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত নিজের হাতে রেখেছিলেন বিদেশ নীতি এবং যুদ্ধ দপ্তর। স্বরাষ্ট্র এবং অর্থের দায়িত্বে ছিলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনার প্রধান সুশীল কুমার ধারা ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে। পাশাপাশি জাতীয় বাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া বিদ্যুৎ বাহিনীর দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল।[৩২]

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বর এবং এই সরকারের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৪ এর ১ সেপ্টেম্বর। মহাত্মা গান্ধী যখন ১৯৪৪ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন তখন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত জাতীয় সরকারের বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মহিষাদল এসেছিলেন। তমলুক মহাকুমার মহিষাদলে অবস্থানকালের শেষ দিনে ২৯শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত। তমলুকে তথা মহিষাদলে মহাত্মাজী অতিবাহিত করলেন পাঁচদিন। ৩০ ডিসেম্বর তিনি যাত্রা করেন কাঁথির উদ্দেশ্যে।[৩৩]

তাম্রলিপ্ত শহরে অ্যানি বেসান্ত থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, জীবনানন্দ দাশ, ইন্দিরা গান্ধী, অরুনা আসক আলী, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, কৈলাসনাথ কাটুজ এবং সাহিত্যিক নিহার রঞ্জন গুপ্ত এসেছিলেন। তাম্রলিপ্তে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভাগমন এবং তাম্রলিপ্তবাসীদের এই দুর্লভ সুযোগ ও সৌভাগ্য তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে এক আলোক উজ্জ্বল অধ্যায় বলা যেতে পারে।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাম্রলিপ্তের গৌরবময় ঐতিহ্য বিরাজিত। বর্তমানকালে সংগীত, নৃত্য চর্চা, চিত্র ও ভাস্কর্যে, নাটক যাত্রা, কবিগান এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ সবকিছু দিক থেকেই তাম্রলিপ্ত পুরনো ঐতিহ্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং বর্তমান ঐতিহ্যকে মেলবন্ধন করে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে বিমান দাস, পরেশ মাইতি ভাস্কর্য শিল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ইংল্যান্ডসহ ইউরোপ আমেরিকায় বহু শহরে বিমান দাসের ভাস্কর্য শিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে। পরেশ মাইতি খুব কম বয়সে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। ২০১৪ সালে পরেশ মাইতিকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। যিনি তমলুকের গৌরব আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মনিলাল ভৌমিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছেন। ডঃ মনি লাল ভৌমিক পদার্থবিদ্যায় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। ডঃ মনি লাল ভৌমিকের পৈত্রিক বাড়ি এই তাম্রলিপ্ত। সর্বশেষে বলা যায় এই তাম্রলিপ্তের সমাজ সংস্কৃতি, এখানকার জনশক্তি এবং মানুষদের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে আলোচিত হয়ে যাবে।

Reference:

১. রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩, কলিকাতা, পৃ. ১২১
২. রায়, নীহার রঞ্জন, পূর্বক্তো, পৃ. ১৫৭
৩. জানা, যুধিষ্ঠির, (মালীবুড়ো); বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, প্রকাশক কলিকাতা পুস্তকালয়, কলিকাতা, পৃ. ২৮
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহন প্রকাশনী কলকাতা, পৃ. ২০
৫. মাইতি, তাপস, কথা মুখ, তাম্রলিপ্তের কথা, মেদিনীপুর অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১১
৬. মালীবুড়ো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৭. মালীবুড়ো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
৮. মালীবুড়ো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৯. সেবানন্দ ভারতী; তমলুকের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে, পৃ. ৬৯
১০. মালীবুড়ো পূর্বোক্ত পৃ. ৪
১১. মাইতি, ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার, তাম্রলিপ্ত বন্দর শহর, তাম্রলিপ্তের কথা সম্পাদনা তাপস মাইতি, নভেম্বর ২০১৪, মেদিনীপুর, পৃ. ৪৮
১২. মাইতি, ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
১৩. মাইতি, ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
১৪. মাইতি, ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার, পূর্বোক্ত পৃ. ৫২
১৫. মালীবুড়ো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
১৬. w.w. Hunter; orissa, vol-1, london, smith elder & co15, waterloo place, p. 309
১৭. কুন্ডু, ডঃ কমল কুমার, তমলুকবাসীর ধর্ম চেতনা, তাম্রলিপ্তের কথা, সম্পাদনা তাপস মাইতি, মেদিনীপুর, পৃ. ৯১
১৮. কুন্ডু, ডঃ কমল কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১৯. সেবানন্দ ভারতী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
২০. বসু, সুদেষ্ণা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই এপ্রিল ২০১৮ বাংলার সিনেমার আপন জন শমিত ভঞ্জ।
২১. মহাপাত্র, রাজর্ষি, জল জলাশয়, তাম্রলিপ্তের কথা, সম্পাদনা তাপস মাইতি, মেদিনীপুর, পৃ. ৪৩৪
২২. মাইতি, ডঃ হরিপদ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাম্রলিপ্তের জনগণ, তাম্রলিপ্তের কথা, সম্পাদনা তাপস মাইতি, মেদিনীপুর পৃ. ৪৪৭
২৩. মাইতি, ডঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮
২৪. মাইতি, ডাঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০
২৫. মাইতি, ডাঃ, হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 651 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৬. দত্ত, অভিরূপ, স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিল বাংলা, ইতিহাস তৈরি তমলুকে,১৮ই আগস্ট ২০২২, এবিপি আনন্দ, কলাম ১

২৭. দত্ত, অভিরূপ, পূর্বোক্ত. কলাম ৪

২৮. Majumdar, R. C. History of the freedom movement in India volume 3, published by Firma K.L. Mukhopadhyay, 6/1A, Banchharam Ankur. lane, Calcutta 12, India. P. 654

২৯. মাইতি, ডঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩

৩০. মাইতি, ডঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

৩১. মাইতি, ডঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৩২. দত্ত, অভিরূপ, পূর্বোক্ত, এবিপি আনন্দ, কলাম ১০

৩৩. মাইতি, ডঃ হরিপদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২